লোকসংগীতে দাসপ্রথার প্রতিফলন

মুহাম্মদ আরিফ ওবায়দুল্লাহ*

[**সারসংক্ষেপ :** সমাজবিজ্ঞান ও ফোকলোর জ্ঞানকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য শাখা। সমাজবিজ্ঞানে সামাজিক স্তরবিন্যাসের আলোচনায় দাসপ্রথা প্রসঙ্গ বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়। কারণ সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে এ প্রথার প্রচলন শুরু হয়েছিল। আবার ফোকলোরের গুরুত্বপূর্ণ ধারা লোকসংগীতে দাস ও দাসপ্রথার কথা নানাভাবে বিধৃত হয়েছে। বিভিন্ন লোকসংগীতে দাসের ধরন, দাস কেনা-বেচার প্রক্রিয়া, দাসদের কর্ম সংক্রান্ত অনেক বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এ কারণে সমাজবিজ্ঞান ও লোকসংগীতের আলোচনা ও গবেষণায় দাসপ্রথা প্রসঙ্গ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সাধারণ বর্ণনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে বর্তমান প্রবন্ধে দাস ও দাসপ্রথার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের পাশাপাশি লোকসংগীতে এ প্রথার প্রতিফলন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।]

সংকেত শব্দ : লোকসংগীত, দাসপ্রথা, *মৈমনসিংহ গীতিকা*, *চর্যাপদ*, *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন*, লালন।

ভূমিকা

দাসপ্রথা উল্লেখযোগ্য প্রাচীন প্রথা। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দাসের উদ্ভব মানব সমাজে ঘটেছিল। আর তাই এ প্রথা প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত ছিল। মানুষই মানুষকে দাসে পরিণত করেছে, এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে বলা যায় বাধ্যও করেছে। সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামাজিক স্তরবিন্যাসে দাসপ্রথা বিশেষভাবে আলোচিত হয়ে থাকে। অপরদিকে বাংলাদেশের সংগীত বিশেষ করে লোকসংগীতের ইতিহাসও বেশ পুরোনো। বাঙালি জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য, যাপিত জীবন তথা জীবনচর্যার প্রণালি লোকসংগীতে বিধৃত হয়েছে। বাংলাদেশের লোকসংগীতে দাসপ্রথা প্রসঙ্গ নানাভাবে উঠে এসেছে। ফলে সমাজবিজ্ঞান ও লোকসংগীত উভয় গবেষণায় দাসপ্রথা নিয়ে আলোচনার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। 'লোকসংগীতে দাসপ্রথার প্রতিফলন' সম্পর্কিত আলোচনায় দাস ও দাসপ্রথার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ও লোকসংগীতে এর প্রভাব কীভাবে পড়েছে তা তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে।

ক. দাস ও দাসপ্রথা

দাস পুরুষবাচক শব্দ, এর স্ত্রী বাচকতা বোঝাতে বাংলায় সাধারণত 'দাসী' শব্দ ব্যবহৃত হয়। এছাড়া দাসী অর্থে বান্দী > বাঁদি এসব শব্দও কখনো কখনো প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। দাসের প্রতিশব্দ হিসেবে কোথাও কোথাও আবার 'গোলাম' শব্দটিও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। দাস সম্পর্কে রংগলাল সেন তাঁর *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস* গ্রন্থে যে সংজ্ঞার্থের কথা বলেছেন প্রসঙ্গক্রমে এখানে তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> দাস হচ্ছে এমন একজন মানুষ যাকে আইন ও প্রথা দ্বারা অন্যের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। চূড়ান্ত অর্থে সে সম্পূর্ণভাবে অধিকারহীন একটি প্রাণীমাত্র। সে তার মালিকের অস্থাবর সম্পত্তি। তাকে কেনা-বেচা যায়। (রংগলাল, ২০১৪ : ৩)

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা।

সমাজবিজ্ঞানী যাঁ যাক্ রুশো দাসপ্রথা ও দাস কেনা-বেচার প্রক্রিয়াকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি। তাই দাস ও দাসত্ব সম্পর্কে তিনি বলেছেন– "ক্রীতদাস করার অধিকার সর্বতোভাবে অমূলক, বেআইনী ও নিরর্থক। 'দাসত্ব' ও 'অধিকার' এ দুটি শব্দ চিরকালের জন্য বিপরীত অর্থবোধক ও দূরকেন্দ্রিক" (রুশো, ১৯৯৫ : ৯)। সাধারণভাবে বলা যায় দাসপ্রথা এমন একটি অবস্থা যেখানে একজন মানুষের মালিকানা অন্য আরেকজনের কাছে থাকে। একসময় দাসকে আইন দ্বারা সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হতো এবং সাধারণভাবে মুক্ত ব্যক্তির মতো প্রাপ্য বেশিরভাগ অধিকার থেকে সে বঞ্চিত ছিল। তবে দাস কিংবা দাসত্বের সংজ্ঞার্থ সম্পর্কে সকলে একমত হতে পারেননি। তবু সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং অন্যান্য যাঁরা দাসপ্রথা কিংবা দাসত্ব নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করেন তাঁদের মধ্যে সাধারণ একটা ধারণা রয়েছে যে, একজন ব্যক্তিকে দাস হিসেবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়। যেমন : দাস একপ্রকার সম্পত্তি যা অন্যের অধীন, এরা শারীরিক ও মানসিকভাবে অন্য সব মানুষের মতো হলেও সামাজিক মর্যাদায় অধস্তন এবং পরাধীন। প্রাচীনকালের কিছু সমাজে দাসদের স্থাবর সম্পত্তি আবার কিছু সমাজে আবাসনের মতো অস্থাবর সম্পত্তিও মনে করা হতো। দাসদের অন্যের প্রভাবে বা হুকুমে জীবনধারণ ও জীবনযাপন করতে হয়। (সিরাজ, ২০১৭ : ১৯)

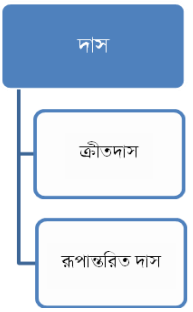
দাসপ্রথার সঙ্গে ভূমি কিংবা সম্পত্তি মালিকানার একটা যোগসূত্র রয়েছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে সমাজে এ প্রথার উদ্ভব হয়েছে। আদিম সমাজে মানুষ যখন চাষাবাদ শেখেনি, ভূমিব্যবস্থা বা কৃষিনির্ভর অর্থনীতি তৈরি হয়নি তখন হয়তো দাসপ্রথা ছিল না। কারণ কৃষিকাজের সঙ্গে শ্রমবিভাজন জড়িত হলে, ভূমির মালিকানা সৃষ্টি হলে এ প্রথার উদ্ভব হয়। প্রায় প্রতিটি সভ্যতার ইতিহাসে কোনো না কোনোভাবে এ প্রথার বর্ণনা লক্ষ করা যায়।

প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায় দাসপ্রথার প্রচলন ছিল। শুধু প্রচলন নয়, এ প্রথা রীতিমতো ব্যবসা হিসেবে চালু ছিল। সে সময় দাস কেনা-বেচা হতো। এমনকি বিদেশ থেকে দাস আমদানিও করা হতো। গ্রিকরা তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট বলে যাদের গণ্য করতো সেই এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল এবং অন্যান্য বিদেশি রাষ্ট্র থেকে দাস আমদানি করতো। এ দাসপ্রথা গ্রিক-সভ্যতার কলঙ্ক হিসেবে আখ্যায়িত হলেও গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল একে একটি স্বাভাবিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনে করেছেন। তিনি এ প্রথাকে স্বীকৃতিও দিয়েছেন। দাসের সংজ্ঞার্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে অ্যারিস্টটল বলেছেন– "গৃহকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য কিছু সজীব ও কিছু নির্জীব সরঞ্জামাদির প্রয়োজন হয় এবং এগুলোকে মূলত সম্পত্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। গৃহকর্মে অন্যান্য সরঞ্জামের মতো গৃহদাসেরও বিশেষ প্রয়োজন। সরঞ্জাম হিসেবে এ গৃহদাস হলো সজীব প্রকৃতির সম্পত্তি এবং সম্পত্তি হিসেবে সে একজন দাস।" দাসপ্রথার স্বাভাবিক উৎপত্তিকে সমর্থন করতে গিয়ে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, কেউ স্বাভাবিক প্রভু এবং কেউ স্বাভাবিক দাস হয়ে জন্মগ্রহণ করে। কারণ পৃথিবীতে শাসন এবং অধীনতা এ দুটিই আছে। প্রভু এবং দাস এদের সম্মিলিত চেষ্টায় গৃহকর্ম পরিচালিত হয় এবং এক্ষেত্রে একের প্রতি অন্যের অধীনতার কথাও স্বীকার করা হয়। (বজলুল, ২০০২ : ২২-২৪)

বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতায় দাসপ্রথা প্রচলনের কথা জানা গেলেও আমাদের এ অঞ্চলে এ প্রথা ছিল কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে এখানে দাসপ্রথা ছিল না এ কথা বলা সঙ্গত নয়। কারণ আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশের পর অনার্যদের দাস হিসেবে গণ্য করতো। যুদ্ধে যারা পরাজিত হতো তাদেরকেই তারা দাস বানিয়ে রাখতো। ভারতবর্ষে দাসপ্রথার সূত্রপাত এভাবেই হয়েছিল। দাসের সন্তান আবার দাস হিসেবে গণ্য হতো। এসব দাস ক্রয়-বিক্রয় করা যেতো এবং সময়মতো বন্ধকও রাখা হতো। অর্থাভাবে অনেকে সপরিবারেও দাসত্ব বরণ করে নিতো।

অনেকে আবার ঋণের জালে আবদ্ধ হয়ে, কেউ আবার অসৎ কর্মের শাস্তিস্বরূপ দাসে পরিণত হতো (পরিমল, ১৯৯২ : ১৮৯)। অনেকের মতে, আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষে দাসপ্রথার অস্তিত্ব ছিল না। আর্যরা এসে এখানে যে জাতিভেদ প্রথা সৃষ্টি করেছিল তাতে দেখা যায় শূদ্রদের জীবন ছিল দাসের জীবন। তারা তাদের উচ্চবর্ণের দাস ছিল। শূদ্ররা তার উচ্চবর্ণের কারও সঙ্গে বৈবাহিক কিংবা অন্য কোনো সামাজিক বন্ধন স্থাপন করতে পারতো না। সকল কায়িক শ্রম তাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল এবং এ থেকে উত্তরণের উপায়ও তাদের ছিল না। খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে কৌটিল্য বা বিষ্ণুগুপ্ত কর্তৃক রচিত *অর্থশাস্ত্রে* দাস ও শ্রমিকদের সম্পর্কে নিয়ম-বিধি উল্লেখ করা হয়। এ বিধান অনুযায়ী আর্যদের দাসত্ব নিষিদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ আর্যরা কখনো দাস হবে না। কিন্তু শূদ্র-সন্তানদের দাস হওয়া বা দাস বানানোর বিষয়কে অনুমোদন দেওয়া হয়। (সিরাজ, ২০১৭ : ৪৮-৪৯)

বৈশিষ্ট্য বিচারে দাসকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ফেলা যায়। তবে দু-ধরনের দাসকে এ আলোচনায় বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এক. ক্রীতদাস ও দুই. রূপান্তরিত দাস :



চিত্র : চিহ্নিত দাসের ধরন

রূপান্তরিত দাস হলো যারা প্রকৃত অর্থে দাস ছিল না কিন্তু নানা প্রক্রিয়ায় সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়ে দাসে পরিণত হয়েছে। অনেকে বাধ্য হয়ে, অনেকে আবার প্রয়োজনের তাগিদে খত বা চুক্তিনামার মাধ্যমে স্বেচ্ছায় দাসে পরিণত হয়েছে। আর ক্রীতদাস হলো সেসব দাস-দাসী যাদের ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে গ্রহণ বা বর্জন করা হতো। এদের মালিকানাও বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত হতো। ক্রয়কৃত এসব দাস-দাসীকে দিয়ে তাদের মালিকেরা গৃহকর্ম থেকে শুরু করে শ্রমনির্ভর বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন করাতো। দাসীরা সাধারণত গৃহের অভ্যন্তরে মালিকের স্ত্রী-পরিজনের সেবাযত্নে নিয়োজিত থাকতো। ক্রীতদাসের সন্তানরাও আবার দাসে পরিণত হতো।

নানা কারণে প্রাচীন দাসপ্রথা একসময় সমাজ থেকে উঠে যায়। বিভিন্ন ধর্মও একপর্যায়ে এসে দাসপ্রথাকে নিরুৎসাহিত করে। দাসপ্রথা উঠে গেলেও অনেক মানুষ দাসত্বের শিকলবন্দি থেকে গেছে। ফলে আমাদের সাহিত্য-সংগীতের ভাবাবেগে পুরোনো দাসপ্রথার কথা যেমন আছে তেমনি দাসত্বের শৃঙ্খলের কথাও পাওয়া যায়। এমনকি পুঁজিবাদী ও ভোগবাদী সমাজে আমাদের অনেককে এখনও নানাভাবে দাসত্ব কিংবা দাসত্বের মনোবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়।

খ. লোকসংগীতে দাসপ্রথা

আমাদের সাহিত্যের পুরোনো নিদর্শন চর্যাপদেও তৎকালীন সময়ের শ্রেণিবৈষম্যের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন শ্রমজীবী মানুষের কথা, তখনকার শ্রমবিভাজনের প্রসঙ্গও এতে উঠে এসেছে। কৃষিকাজ যেমন–ধান ও তুলা উৎপাদন থেকে শুরু করে হরিণ শিকার, মদ চোলাই, নিম্নশ্রেণির

ডোম্বী এদের প্রসঙ্গ চর্যাপদে তুলে ধরা হয়েছে। সে যুগে অভিজাত শ্রেণির মানুষ বাস করতো নগরে আর অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য মানুষেরা বাস করতো নগরের বাইরে। কাহ্নপার পদে উল্লেখ রয়েছে– 'নগর বাহিরে রে ডোম্বী তোহরি কুড়িআ' অর্থাৎ নগরের বাইরে ডোমদের কুঁড়েঘর আছে। এতেই স্পষ্ট হয় সে সময়ের মানুষের মধ্যে শ্রেণিবৈষম্যে প্রকট আকারে ছিল। নিম্নশ্রেণির মানুষের ঠাঁই নগরের অভ্যন্তরে মেলেনি। এছাড়া মৎস্য-শিকারি, মাঝিমাল্লা, কাঠুরিয়া, ছুতার প্রভৃতি পেশাজীবীদের বর্ণনা চর্যাপদে রয়েছে। এর মাধ্যমে তৎকালীন সময়ের শ্রমবিভাজনের চিত্রও প্রতিভাত হয়। অনুমান করা যায়, এসব লোকজন নগরের উচ্চশ্রেণির মানুষের সেবাদাস হিসেবে নিয়োজিত ছিল। মধ্যযুগেও বাঙালির বিভিন্ন পেশা, আমোদ-প্রমোদের চেহারা প্রায় একই রকম থেকে গেছে। এর পরিচয় মধ্যযুগের সাহিত্য বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যগুলোতে পাওয়া যায় (শম্ভুনাথ, ২০১২ : ৪৮, ৯৫)। তবে সংগীতচর্চার বিশেষ আবহ এ যুগেই বিশেষভাবে তৈরি হয়েছে তা বলা যায়। কারণ মঙ্গলকাব্যগুলো গীত হতো। আর গীতিকবিতার বিভিন্ন ধারার প্রচলন, বাউল সংগীতের উদ্ভব ও বিকাশও এ মধ্যযুগেই।

চর্যাপদের পরে বাংলা ভাষার পুরোনো নিদর্শন *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*। এটিই মূলত চর্যাপদ পরবর্তী বাংলা গীতগ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেম-ভক্তির প্রভাব দীর্ঘসময় ধরে ছিল। বাংলা গীতসাহিত্য ধারায় এ ভক্তিভাব চর্চিত হয়েছে। এ গ্রন্থ রচনার সময় নির্ধারণ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে ধারণা করা হয় এটি পনেরো শতকের পূর্বে রচিত হয়েছে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* গ্রন্থে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলায় চন্দ্রাবলী তথা রাধা নিজেকে দাসী হিসেবে কৃষ্ণের কাছে সঁপে দিয়েছে। এ বর্ণনা 'বংশী খণ্ডে'র শেষে লক্ষ করা যায় :

> হের ভালমতেঁ চাহি নেহ কাহ্নাঞিঁ বাঁশী।
> আজি হৈতেঁ চন্দ্রাবলী হৈল তোর দাষী ॥ (হাই ও পাশা, ১৪০৭ : ১৩৮)

অর্থাৎ কৃষ্ণের বাঁশি চুরি করে ফেরত দেওয়ার সময় রাধা কৃষ্ণের উদ্দেশে বলছে : 'কানাই, ভালো করে চেয়ে দেখ, এই নাও তোমার বাঁশি। আজ থেকে চন্দ্রাবলী (রাধার অপর নাম) তোমার দাসী হলো।' রাধার দাসত্ব বরণ করার এ ইচ্ছা বা প্রবণতা দাসত্ববৃত্তি বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নয়। তবে তৎকালীন সমাজে দাস-দাসীর ব্যাপার যে প্রচলিত ছিল তার ইঙ্গিত এখানে রয়েছে।

পদাবলি সাহিত্য ধারার বিভিন্ন পদ বিশেষ করে বৈষ্ণব পদাবলি কিংবা বাউল পদাবলিতেও দাসপ্রথার নানা বর্ণনা ও ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। বৈষ্ণব মতে, জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন তথা স্রষ্টা-সৃষ্টির একাত্ম হওয়ার সাধনা খুব তাৎপর্য বহন করে। বৈষ্ণব পদাবলিতে এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয় প্রতীকীভাবে মূর্ত হয়েছে। স্রষ্টা প্রভু আর জীব হলো প্রভুর দাস। বৈষ্ণবরা প্রভুর কাছে নিজেকে দাস হিসেবে সঁপে দেয়। এতে তথাকথিত দাসপ্রথার আক্ষরিক চিত্র পাওয়া না গেলেও সমাজে যে উচ্চ ও নিম্নবর্ণ ছিল, নিম্নবর্ণের লোকজন যে দাস হিসেবে গণ্য হতো তার ইঙ্গিত অনেকটা বহন করে। প্রসঙ্গক্রমে বৈষ্ণব পদকর্তা মীর ফয়জুল্লাহ্‌র একটি পদের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। পূর্বে উল্লিখিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* পদের মতো এখানেও রাধাকে কৃষ্ণের কাছে দাসী হিসেবে সমর্পিত হতে দেখা যায় :

> দেখি শ্যাম মোহনিয়া।
> এ রূপ যৌবন করিয়া নিছন
> রাঙ্গা পদে ভজ গিয়া॥ [...]
> বাঁশের বাঁশি গরল রাশি
> যুবতী বধিতে ফাঁসি।
> শুনিয়া ও ধ্বনি কুলের রমনী

বিনিমূলে হয় দাসী॥
মীর ফয়জুল্লাহ্ ভণে লাগলি নয়নে
কেমনে ধৈরজ ধরি। (হাই ও শরীফ, ২০০৫ : ৪২)

উপর্যুক্ত পদে রাধাকে 'বিনিমূলে' অর্থাৎ বিনামূল্যে শ্যাম বা কৃষ্ণের দাসী হতে দেখা যায়। রাধা প্রচলিত অর্থে দাসত্ববৃত্তি না করলেও দাস-দাসীতে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণের একটা ব্যাপার ছিল অর্থাৎ তৎকালীন সময়ে দাস-দাসী কেনা-বেচা হতো সে ইঙ্গিতও এখানে লক্ষণীয়।

প্রচলিত দাসপ্রথার ধারণায় দাসকে বাধ্য হয়ে সমাজের মালিক বা প্রভুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হতো বা করতে হয়। আর ধর্মবিশ্বাসে নিজেকে দাস মনে করে স্রষ্টার কাছে বা গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করা হয় স্বেচ্ছায়, তাঁকে ভালোবেসে। এ প্রসঙ্গে বাউল পদাবলির অন্তর্ভুক্ত হরিদাস বাউলের একটা পদের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে যেখানে পূর্ববর্তী *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কিংবা বৈষ্ণব পদাবলির পদগুলোতে যেমন খুব সাধারণভাবে দাস হিসেবে স্রষ্টার কাছে নিজেকে সমর্পণ করা হয়েছে এখানেও ঠিক তেমনি গুরু প্রসন্ন গোঁসাইয়ের কাছে নিজেকে দাস হিসেবে সমর্পণ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়েছে :

গোঁসাই প্রসন্নেরি দাস,
অধম হরির এই অভিলাষ–
রাখ গুরু চরণের পাশ,
দয়ায় করাও মানুষ-দরশন॥ (হাই ও শরীফ, ২০০৫ : ২৭৪)

গুরুর নিকট দাস হিসেবে আত্মসমর্পণের দৃষ্টান্তস্বরূপ উপরিউল্লিখিত বাউল পদের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এ রকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে যেখানে দাস-দাসী প্রসঙ্গ নানাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বিশেষ করে লালনের অনেক গানে দাস-দাসী প্রসঙ্গ ও দাসপ্রথা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে। স্রষ্টার কাছে দাসী হওয়ার উদগ্র বাসনা লালনের গানে এভাবে লক্ষ করা যায় :

আমার মনের বাসনা
আশা পূর্ণ হলো না॥

দাসী হব যুগল পদে
সাধ মিটাব ঐ পদ সেধে
বিধি বৈমুখ হল তাতে
দিল সংসার যাতনা॥ (আনোয়ার, ১৯৯৫ : ৯৮)

দাসদাসী পছন্দ না হলে, মনের মতো না হলে তাদের ত্যাগ করা হতো তার ইঙ্গিতও লালনের গানে রয়েছে। কানাই দাস-দাসী ত্যাজ্য করে একা একা ফিরছে তার বর্ণনা একটি গানে লক্ষ করা যায় :

দাসদাসী ত্যাজিয়ে কানাই
একা একাই ফিরছ রে ভাই
কাঙাল বেশ ধরে;
ভিখারী হলি, কেঁথা সার করলি
কিসের অভাবে রে॥ (আনোয়ার, ১৯৯৮ : ১৭২)

দাসের সঙ্গে মালিকের চুক্তিনামাকে 'দাসখত' বলে। অর্থাৎ যখন দাস-দাসী রাখা হতো তখন কিছু শর্ত তাদের বেঁধে দেওয়া হতো। সে অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী তারা কাজ করতো। এটাই দাসখত। লালনের একটি গানে দাসখত প্রসঙ্গ এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

ত্রিজগতের চিন্তা শ্রীহরি
আজ কি নারীর চিন্তা হলেন গো হরি
অসম্ভব বচন, ভেবে কয় লালন
রাধার দাসখতে শ্যাম বিকালে (আনোয়ার, ১৯৯৮ : ১৯৮)

আবার আরেকটি গানে লক্ষণীয়– "দেখরে সেই প্রেমের লেগে/ হরি দিল দাসখত লিখে"। এসব বর্ণনায় প্রতীকী বিচারে দাসখতের উল্লেখ থাকলেও দাসপ্রথায় এরকম চুক্তিনামার ব্যাপার যে ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। শুধু লালন ফকির কিংবা অন্যান্য বাউলগানে নয়, বিভিন্ন ধারার লোকসংগীতে দাসখতের প্রসঙ্গ উল্লেখ রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ফরিদপুর অঞ্চলে প্রচলিত জারি গান 'মোসলেমের জারি'র কথা বলা যায়। এ জারি গানের প্রারম্ভে এজিদের চক্রান্ত বর্ণিত হয়েছে। কুফা শহরের অধিকর্তা আবদুল্লাহ জেয়াদকে নানা প্রলোভনে এজিদ হাত করে। এজিদের কথায় জেয়াদ মদিনাতে হোসেনের নিকট খত লিখে পাঠায়। খতে উল্লেখ ছিল হোসেন কুফায় এলে সে তাঁর অধীনে দাস হয়ে থাকবে। জেয়াদের এ দাসখতের কথা উক্ত জারিতে এভাবে উঠে এসেছে :

মদিনাতে মরভূমি
কিছু নাহি হয়।
এখানেরি আবহাওয়া
ভালো সমুদয় ॥
এখানে আসিয়া তুমি
করো বসবাস।
সেবিব তোমার পদ
হইয়ে তোমার দাস ॥
এ্যাতেক লিখিয়া সেই খত
কাছেদের তরে
পাঠাইয়া দিল সেই
মদিনার শহরে ॥
হোসেন পাইয়া খত
দেখায় মোসলেমেরে। (শাহিদা, ২০১০[ক] : ১০৬)

অতীতে একসময় দাস-দাসী কেনা-বেচা হতো তার প্রমাণ লোকসংগীতে মেলে। দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয়ের বর্ণনা *মৈমনসিংহ* গীতিকার 'দেওয়ানা মদিনা' পালায় লক্ষ করা যায়। আলাল ও দুলাল নামের দুই পুত্র সন্তান রেখে দেওয়ান সোনাফরের প্রথম স্ত্রী মারা গেলে তিনি আবার বিয়ে করেন। প্রথমে দেওয়ান তার পুত্রদের সৎ মায়ের কাছে রেখে প্রতিপালন করতে না চাইলেও একসময় দ্বিতীয় স্ত্রীর ছলনায় ভুলে আলাল ও দুলালকে তার কাছে প্রেরণ করে। পথের কাঁটা দূর করার জন্য দেওয়ানের স্ত্রী তার সতীন-পুত্রদের হত্যার উদ্দেশ্যে জল্লাদের হাতে তুলে দেয়। জল্লাদের মায়া হলে সে তাদের হত্যা না করে ধানের বাণিজ্য করে এমন এক সাধু সওদাগরের নিকট হস্তান্তর করে। পরবর্তী সময়ে এ সাধু সওদাগর আলাল ও দুলাল দুই ভাইকে ইরাধর নামের এক গৃহস্থের নিকট বিক্রি করে দিলে তাদেরকে গৃহস্থের সেবাদাস বা চাকর হিসেবে দাসত্ব বরণ করে নিতে হয় :

ধনুয়া নদীর পারে কাজলকান্দা বাড়ী।
তাইতে না বসতি করে ইরাধর বেপারী ॥
গিরস্থি করিয়া বেচে একশ পুড়া ধান।
এমন গিরস্থ নাই তাহার সমান ॥
ইরাধরের বাড়ীৎ সাধু ধান না কিনিয়া
আলাল দুলালে কিম্মত দিল দাম ধরিয়া ॥
আলাল দুলাল থাকে সেই না বাড়ীতে।
দেওয়ান পুত্র অইয়া কত কষ্ট কপালেতে ॥ (দীনেশচন্দ্র, ১৪০৭ : ৩৭৯-৩৮০)

রাজা-বাদশাহ, জমিদার ও ধনিক-শ্রেণির লোকজন তাদের আয়েশি জীবনযাপন, নিত্যকর্ম সম্পাদন প্রভৃতির জন্য নিজেদের অধীনে অনেক দাস-দাসী রাখতেন। তাদের এ জীবন ছিল জৌলুসপূর্ণ। এসব ধনাঢ্য পরিবারের অধিকাংশ মানুষ নানা চাকর-চাকরানি বা দাস-দাসী পরিবেষ্টিত হয়ে দিনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। নিত্যদিনের নানা কর্ম সম্পাদনে তারা দাস-দাসীর শরণাপন্ন হতেন। আর তাই তাদের এমন যাপিত জীবনে এসব দাস-দাসীর যে বিস্তর প্রভাব থাকতো তার পরিচয় রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত পালাগান 'কুসুম কামিনী কইন্যা'য় লক্ষ করা যায়। স্নানকার্যে সহযোগিতার জন্য দাসী ব্যবহারের চিত্র এ পালাগানটিতে এভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে :

শোন শোন ওরে দাসীগণ
মুই যে কও তোমারে
হাঁটো এ্যালা যাই হামরা গো
চান করিবারে গো। (মরি হায় ওহে)

দাসী বান্দিক নিয়া কইন্যায়
চান কইরবার গ্যালো (শাহিদা, ২০১০[খ] : ১৮২)

মানুষ তার অধীনে থাকা দাস-দাসীদের সবসময় নিজের কাছেই রাখতো না, স্বজন-পরিজনদের সুবিধার্থে কখনো কখনো এসব দাস-দাসী বিনিময় হতো। উপঢৌকন হিসেবেও দাস-দাসী প্রদান করার চল বা রীতি একসময় সমাজে ছিল। এসব প্রমাণ লোকসংগীতে রয়েছে। কন্যা বিদায়ের সময় জামাইকে নানা উপহার প্রদানের পাশাপাশি মেয়ের সুখের কথা চিন্তা করে অনেক দাসীও সঙ্গে দেওয়া হতো। রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত 'জয়নুব বাশ্‌শা পালা'য় এমন চিত্র লক্ষণীয় :

হায়রে বেটি জামাইক বিদ্যায় করে বাশ্‌শা
দুই চউকোত্ বয়রে পানি ॥

ওরে দানে দিলে কতো রে জিনিস
কতো দাসী দিলো সাতে।
মাটির খোরা শাটির থালিরে (শাহিদা, ২০১০[খ] : ৫২)

দাস-দাসীর প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কখনো ভালো ছিল না। সমাজে এদেরকে বরাবরই নীচু জাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অচ্ছুৎ বা খারাপ জিনিস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত অনেক কিছু যেমন গালি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, ঠিক তেমনি নিম্নশ্রেণির মানুষ হিসেবে চিহ্নিত দাসী বা বাঁদি অথবা তাদের সন্তানাদিকে গালি হিসেবে ব্যবহার করতে দেখা যায়। ইসলামের ইতিহাসে ইয়াজিদ একজন খল চরিত্র। ইয়াজিদের চক্রান্তে ও প্রত্যক্ষ মদদে ইমাম হোসেনকে (রা) কারবালার প্রান্তরে হত্যা করা হয়। ইতিহাসে সেজন্য ইয়াজিদ এত ঘৃণিত। মুসলমান সমাজে

সে এতটাই ঘৃণার পাত্র ছিল যে, একটি জারিগানে ইয়াজিদকে 'বান্দীর বাচ্চা' উল্লেখ করে গালি দেওয়া হয়েছে :

পানির লাগি পায় দুখ
আলীর বেটা হুছনে
বান্দীর বাচ্চায় দেয় দুখ
সহ্য করি কেমনে।
দুঃখ সহন না যায়
যত দুঃখ ইমামে দিলো
দুষ্ট এজিদায়। (শাহিদা, ২০১০[গ] : ২৯-৩০)

সুতরাং 'বান্দীর বাচ্চা' বা 'বাঁদির বাচ্চা' এরকম শব্দ প্রয়োগে কাউকে গালি দেওয়ার অর্থ হচ্ছে দাসী বা বাঁদিরা নিকৃষ্ট জাত হিসেবে চিহ্নিত ছিল। সমাজে ধনিক শ্রেণি তাদেরকে দিয়ে নানা কর্ম-সম্পাদন করালেও, তাদের ব্যবহার করে সুবিধা ভোগ করলেও, দাস-দাসীদের কখনো স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। তারা সবসময়ই বঞ্চিত ও অবহেলিত থেকেছে।

পুরুষ দাসদের মধ্যে অনেকে ঘরের বাইরে বিভিন্ন কাজকর্ম করতো। এমনকি নানা কারণে তাদের বাইরে যাতায়াত করার সুযোগও থাকতো। কিন্তু দাসী ও শিশু দাসদের ক্ষেত্রে সে সুযোগ তেমন একটা ছিল না। এদের বেশিরভাগকে অন্দরমহলে রাখা হতো। এরা ছিল মূলত গৃহকর্মে নিয়োজিত দাস। অভিজাত শ্রেণির মানুষ, বিশেষ করে মালিক ও মালিক পক্ষের পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন সেবা তাদের নিশ্চিত করতে হতো। আর এসব সেবা বা কাজের ক্ষেত্রে নারী ও শিশু দাসদের বরাবরই প্রাধান্য দেয়া হতো। (সিরাজ, ২০১৭ : ২৩) দাসীদের অবস্থান থাকতো অন্দরমহলে এর প্রমাণ পাওয়া যায় 'মুছলিম-এর বালকের জারি'তে। মুয়াবিয়াপুত্র ইয়াজিদের সঙ্গে খেলাফত নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য ইমাম হোসেন (রা.) তাঁর চাচাতো ভাই মোসলেমকে কুফায় পাঠালে তাঁকে সেখানে হত্যা করা হয়। বাবাকে হারানোর পর মোসলেমের অসহায় দুই পুত্রের আশ্রয় হয় হারিসার বিবির অন্দরমহলে, গোপন কোঠায়। সেখানে দাসীরাই তাদের আগলে রেখেছে :

মুছলিমের পিয়ারা দুই
বালক রতন
বাবা হারাইয়া দুহে
করইন কান্দন
বিপাকে ঠেকিলা গিয়া
হারিছার ভুবন।
হায় হায়–
হারিছার বিবি নিয়া
বালকে তখন
পুষিদা মহলে নিয়া
করিলা গোপন
কেউ নাহি জানে কেবল
জানইন দাসীগণ। (শাহিদা, ২০১০[গ] : ৫৪)

কারবালার কাহিনিকেন্দ্রিক হওয়ায় উপর্যুক্ত জারিগানে আরবের দাসপ্রথা চিত্রিত হলেও এর মাধ্যমে দাসীদের কর্ম ও তাদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। তবে এসব জারি আরবের কাহিনি, কারবালার কাহিনি বর্ণনা করলেও এর প্রকাশভঙ্গি, উপস্থাপনা, ভাষাপ্রয়োগ

প্রভৃতির কারণে সবকিছু ছাপিয়ে আমাদের এ অঞ্চলের অনেক ঐতিহ্য বহন করে। আবার আরেকটি জারিগান 'রাজেশ্বরীর জারি'তে দাসীদের গৃহকর্মের বিবরণ একদিকে যেমন উঠে এসেছে তেমনি এসব কাজে অসংখ্য দাসী নিযুক্ত থাকতো তার একটা ইঙ্গিতও লক্ষ করা যায়। এ জারির কাহিনির ঐতিহাসিক সত্যাসত্য নির্ণয় করা কঠিন। এখানে লক্ষণীয় হযরত মোহাম্মদের (স.) স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে হযরত আলির (রা.) পুত্র হানিফা নীলকোর শহরের রাজা মোকেমচন্দ্রের কন্যা রাজেশ্বরীকে বিয়ে করতে সেখানে যায়। রাজেশ্বরীর ফুলবাগানে হানিফা উপনীত হলে জল নিতে আসা দাসীদের প্রতিক্রিয়া ও কথোপকথনের দ্বারা তখনকার দাসীদের কর্মপরিধি ও সংখ্যার আধিক্য অনুধাবন করা যায় :

হ্যানো কালে জল নিতি
আলো যতো নারী।
হানিফার রূপ দেখে তারা
দাঁড়ায় সারি সারি॥
এক দাসী বলে দিদি
বলি তোমার ঠাঁই।
জন্মাবধি হ্যামোন রূপ
কভু দেখি নাই ॥
আরাকজন দাসী বলে
শুনো-ল ওলো দিদি।
এই ছোঁড়ার সঙ্গে আমার
বিয়া হতো যদি ॥ (শাহিদা, ২০১০[গ] : ১৪২)

উপর্যুক্ত জারির মাধ্যমে অনুধাবন করা যায় দাসীরা অন্দরমহলে গৃহস্থালির কাজকর্ম করত (যেমন জল আনা)। শুধু তাই নয়, তারা দলবেঁধে মনিবের কন্যার সঙ্গে কখনো কখনো যে রঙ-তামাশায় লিপ্ত হতো সে বিষয়টিও এখানে স্পষ্ট হয়েছে। এছাড়া অন্দরমহলে রাজকন্যাদের সঙ্গে দাসীদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠা, তাদের কাছে নিজের সুখ-দুঃখের কথা প্রকাশ করার এমন চিত্র 'মানিকপাল আজা' পালাতেও লক্ষ করা যায়। অনেক পাত্র দর্শন করে সেখান থেকে পছন্দসই পাত্র বেছে নিতে রাজা তার কন্যাকে নির্দেশ দিলে রাজকন্যা হবু স্বামী হিসেবে কাউকে পছন্দ না হলে দাসীর কাছে সে দুঃখ অনায়াসে ভাগ করে নিয়েছে :

ইতিউতি দ্যাকে কইন্যায়
নজোর বা করিয়া।
নিজের উপের সাতে না মেলে কাকো
সেইজন্যে গ্যালো তাই ঘুরিয়া ॥
(মরি হায় রে হায়)

ওরে সেত্তেই হাতে গ্যালো কইন্যা
বাগান খ্যানার পরে।
দাসীর ঘরে হাত ধরি কইন্যা
নাইগছে কানদিবারে ॥
(মরি হায় রে হায়) (শাহিদা, ২০১০[খ] : ৫৯)

রূপান্তরিত দাসের কথা তথা মানুষকে দাসে রূপান্তর করার ইঙ্গিত অনেক লোকসংগীতে রয়েছে। বাণিজ্য করার জন্য পূর্বে একসময় একদেশ থেকে আরেক দেশে সাধু-সওদাগররা যাতায়াত করত। এসময় তারা বিভিন্ন নারীকে প্রলোভনের ফাঁদে ফেলতো কিংবা প্রেমে পড়ে

অনেক নারী তাদের কাছে ধরা দিত। সওদাগরেরা যেহেতু ব্যবসা-বাণিজ্য তথা বেচাকেনা করত, এসব নারীকেও অনেক সময় তারা বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করে দিত। এভাবে নারীরা দাসীতে রূপান্তরিত হত। এসব সাধুর প্রেমের বর্ণনা ও তাদের থেকে সাবধানে থাকার ইঙ্গিত একটি ভাওয়াইয়া গানে লক্ষ করা যায় :

কোচার করি সাধু না করেন বয়,
পরার নারী সাধু আপন নোয়ায় রে
ও পর নারী সাধু বধিবে পরানো রে ॥ [...]

যেই দিয়া সাধু সাউদের ম্যালা,
সেই দিয়া সাধু ছাঁদেন গোলা রে,
ও বেচিকিনি সাধু করেন সাবধান রে ॥ (ওয়াকিল, ২০০৬ : ২৮৯)

রূপান্তরিত দাসের বর্ণনা পূর্বে উল্লিখিত 'রাজেশ্বরীর জারি'তেও লক্ষ করা যায়। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা একসময় গৃহদাস হিসেবে অনেক চাকর রাখত। এসব চাকরদের কেউ কেউ ভূমিদাস হিসেবেও কাজ করত। এদের অনেকেই ছিলো রূপান্তরিত দাস। 'রাজেশ্বরীর জারি'তে দেখা যায় হানেফ যখন রাজেশ্বরীর নিকট প্রেম নিবেদন করে তখন সে নানা কৌশলে তাকে কাছে রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। রাজেশ্বরী হানেফকে চাকর করে নিজের কাছে রাখতে চায়। হানেফও তার প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হয় :

রাজেশ্বরী বলে নাইড়ে
তোর কথায় সর্বনাশ।
তোরে চাকর কইরে রাখফো বাড়ি
কাটপি ঘোড়ার ঘাস ॥
হানেফ বলে কাটপো ঘাস
জষ্ঠি আষাঢ় মাসে।
তুমি থাকফা আগা নৌকায়
আমি থাকপো ফাশে ॥ (শাহিদা, ২০১০[গ] : ১৫০-১৫১)

জারির উপর্যুক্ত ঘটনাংশে রঙ-তামাশার ছল লক্ষ করা গেলেও নানাকৌশলে কাউকে কাউকে যে দাসে রূপান্তরিত করা হত অথবা নিজ প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় অনেকে দাসত্ব বরণ করে নিত তার ইঙ্গিত এখানে রয়েছে। এ দাসত্ব বরণ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেককে ভাগ্য বিড়ম্বিতও হতে হত। বিশেষ করে নারীর মেনে নেয়া দাসত্ব এ রকম। পরিবারের খামখেয়ালিপনা কিংবা দারিদ্র্যের কারণে অনেক সময় নারীদের দাসত্ব বরণ করে নিতে হত :

আরে ও মোর ভাবের দ্যাওরা,
থুইয়া আয় মোক বাপো-ভাইয়ের দ্যাশে রে ॥
বাপো-ভাই মোর দুরাচার,
ব্যাচে খাইচে মদকিয়ার ঘরে রে ॥ (ওয়াকিল, ২০০৬ : ২৬৪)

পরিবারের দ্বারা বৈষম্যের শিকার এমন নারীর মর্মবেদনা উপর্যুক্ত গানে প্রকাশিত হয়েছে। বাবা ও ভাই মিলে মদ্যপ স্বামীর কাছে তাকে যেন এক ধরনের বিক্রিই করে দিয়েছে। নারীর এমন বিক্রি হয়ে যাওয়া বা মেনে নেওয়া দাসত্বের বর্ণনা আমরা বিভিন্ন লোকসংগীতে লক্ষ করি। আরেকটি গানে দেখা যাচ্ছে গরীব ঘরের মেয়ের বিয়ে ঠিক হচ্ছে ধনাঢ্য পরিবারে। মেয়েটি তার পাণিপ্রার্থী প্রেমিককে অনায়াসে ফিরিয়ে দিচ্ছে নিজেকে ধনী পরিবারে তথা তিনমহলওয়ালা ঘরে চূড়ান্তভাবে সঁপে দেওয়ার আশায়। দারিদ্র্যের কারণে তাকে যেন সেখানে

বিক্রিই হতে হচ্ছে সে কথাও স্পষ্ট হয়েছে তার কথায়। নারীর এমন দাসত্বের বর্ণনা গানটিতে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে :

আমি হই না গরীবের মাইয়া,
তোর সঙ্গে পেম্ করিব নারে,
মোক বলে ব্যাচেয়া খায় তেমালা ঘরে।
আমি শুইনাছি ঘটকের মুখে বাড়ীতে পুষ্করিণী আছে

হস্তিত করিয়া নাইওর করিবে রে,
আই মো পাল্কিত্ করিয়া নাইওর করিবে রে।
মোক বলে ব্যাচেয়া খায় তেমালা ঘরে॥ (ওয়াকিল, ২০০৬ : ৩১০)

'আইয়ুব নবীর জারিগানে' তৎকালীন আরবের দাসপ্রথার বর্ণনা পাওয়া যায়। বিভিন্ন নবির যুগে আরবে দাসপ্রথা ছিল। তাঁদের গোলাম বা দাসেরা পশুপালন থেকে শুরু করে অনেক কাজ সম্পাদন করত তার প্রমাণ এ লোকসংগীতে মেলে। এ জারিগানে দেখা যায় আল্লাহর গজবের কারণে আইয়ুব নবির সব ঘোড়া-আর গরু মারা যায়। এসব গরু আর ঘোড়ার রক্ষণাবেক্ষণকারী গোলাম কাঁদতে কাঁদতে সেকথা নবিকে জানাতে যায়। নবি গোলামের কথা সবিস্তারে শোনেন এবং তাকে ধৈর্যধারণ ক রতে বলেন :

গজব ভেজিল যদি সেই আইয়ুব নবীর পরে
যত ছিল ঘুড়া গরু নবীর গেল মরে।
ঘুড়া গরু যত ছিল ছিল নবীর সকলি মরিল
দেখিয়া নবীজির গোলাম কান্দিতে লাগিল।
কান্দিয়া কান্দিয়া গোলাম করিল গমন
নবীজির কাছে যাইয়্যা দিচ্ছে দরশন।
নবী বইল্যাছে ওরে গোলাম শুন দিয়া মন
আইজ ক্যানে দেখচি তোমার ভাঙ্গা ভাঙ্গা মন।
গোলাম বইল্যাছে নবী তুমার পায় ধুইর‍্যা জানাই
বলি ঘুড়া গরু যত ছিল আইজ কিছু মাত্র নাই।
নবী বইল্যাছে ওরে গোলাম শান্ত কর মন
যার মাল সেই নিয়্যাছে কান্দ কি কারণ। (সামীয়ূল, ২০০৭ : ১০১)

উপসংহার

লোকসংগীতে দাসপ্রথা সম্পর্কিত আলোচনায় দেখা যায়, অনেক মানুষ স্রষ্টার কাছে দাসত্ব বা গোলামি করার জন্য উদগ্রীব থাকে। তাঁদের এ অভিপ্রায় তাঁরা অনেক লোকসংগীতের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এতে দাসপ্রথা বলতে যা বোঝানো হয় তার আক্ষরিক অর্থ বহন না করলেও দাসত্ববৃত্তি সম্পর্কিত অনেক বিষয় যেমন : দাস ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়া, দাসখত লেখা, দাস পরির্তন এ প্রক্রিয়াগুলো উঠে এসেছে। বিশেষ করে ধর্মপ্রভাবিত লোকসংগীত যেমন : বৈষ্ণবপদ, বাউলপদ এসব ধারার মধ্যে প্রসঙ্গগুলোর বর্ণনা বেশি লক্ষ করা যায়। এছাড়া অন্যান্য ধারার লোকসংগীতে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে দাসগ্রহণ প্রক্রিয়া অর্থাৎ যাদের ক্রীতদাস হিসেবে চিহ্নিত করা যায় তাদের বর্ণনা, রূপান্তরিত দাস ও তাদের কর্ম, ভূমিদাস কিংবা গৃহের অভ্যন্তরের ভৃত্য বা চাকর-চাকরানি, বিভিন্ন দাস-দাসী ও তাদের বিবিধ কর্মের বর্ণনা অনেক ধারার লোকসংগীতে উঠে এসেছে। এমনকি সমাজে স্বেচ্ছায় দাসত্ব বরণ করে নেওয়া কিংবা

ভাগ্য বিড়ম্বিত নারীর নানা কারণে দাসত্ব গ্রহণের প্রসঙ্গও বিভিন্ন ধারার লোকসংগীতে লক্ষণীয়। লোকসংগীত ও দাসপ্রথার আলোচনায় কতগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিহ্নিত করা যায় যা লোকসংগীতে উল্লিখিত এবং দাসপ্রথার সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। যেমন : দাস ক্রয়-বিক্রয়, দাসখত বা দাসের চুক্তিনামা, দাস পরিবর্তন বা লেনদেন, দাসদের বিচিত্র জীবনপ্রণালি ইত্যাদি। বিভিন্ন ধারার লোকসংগীত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে সেখানে দাসপ্রথা প্রসঙ্গ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। দাসপ্রসঙ্গ বাউল ঘরানার গানে, বিভিন্ন পালাগানে, জারিগানে, ধুয়াগানে ও ভাওয়াইয়া গানে বেশি লক্ষ করা যায়। কারবালার বিষয়কেন্দ্রিক জারিগানের বিস্তীর্ণ অংশজুড়ে দাস ও দাসপ্রথা সম্পর্কে যেসব প্রসঙ্গ উঠে এসেছে তাতে আরবদের জীবনকথা বর্ণিত হলেও বর্ণনাভঙ্গির স্বকীয়তার কারণে তা আমাদের নিজস্ব হয়ে উঠেছে। সমাজবিজ্ঞানে 'সামাজিক স্তরবিন্যাস' প্রসঙ্গে দাসপ্রথার যে ব্যাপারটি আলোচিত হয়, তার বর্ণনা লোকসংগীতের অনেকাংশ জুড়ে রয়েছে। সুতরাং সমাজবিজ্ঞান ও লোকসংগীত উভয় গবেষণায় লোকসংগীতে উল্লিখিত দাসপ্রথা ও এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

সহায়কপঞ্জি

ওয়াকিল আহমদ (২০০৬)। *বাংলা লোকসংগীতের ধারা*। বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা।

দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পা. ১৪০৭)। *মৈমনসিংহ গীতিকা*। ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

পরিমল ভূষণ কর (১৯৯২)। *সমাজতত্ত্ব* । পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা।

ফকির আনোয়ার হোসেন (সম্পা. ১৯৯৫)। *লালন-সঙ্গীত দ্বিতীয় খণ্ড* । লালন মাজার শরীফ ও সেবা-সদন কমিটি, কুষ্টিয়া।

——— (সম্পা. ১৯৯৮)। *লালন-সঙ্গীত তৃতীয় খণ্ড*। লালন মাজার শরীফ ও সেবা-সদন কমিটি, কুষ্টিয়া।

বজলুল মোবিন চৌধুরী (২০০২)। 'এরিস্টটল', *সমাজ : চিন্তা ও মতবাদ* (সম্পা. : মোকাররাম হোসেন), পুনর্মুদ্রণ। বাংলাদেশ বইঘর, ঢাকা।

মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (১৪০৭)। *বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য* (সম্পাদিত), ষষ্ঠ সংস্করণ। ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ (২০০৫)। *মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতা* (সম্পাদিত), নবম মুদ্রণ। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

যাঁ যাক্ রুশো (১৯৯৫)। *সমাজ-সংস্থা*, অনুবাদ : নূর মোহাম্মদ মিঞা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রংগলাল সেন (২০১৪)। *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস*, দ্বিতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ। নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (২০১২)। *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে সমাজতত্ত্ব*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

শাহিদা খাতুন (২০১০[ক])। *বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংগ্রহমালা* ৩ (সম্পাদিত)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

——— (২০১০[খ])। *বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংগ্রহমালা* ৬ (সম্পাদিত)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

——— (২০১০[গ])। *বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংগ্রহমালা ৪* (সম্পাদিত)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সামীয়ূল ইসলাম (২০০৭)। *বাংলাদেশের লোকসংগীতের শ্রেণীবিন্যাস*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সিরাজ উদ্দিন সাথী (২০১৭)। *দাস প্রথা*, দ্বিতীয় মুদ্রণ। অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা।